সায়েন্স ফিকশন

প্যারালাল

সাইফ ইমন

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গ্র্যান্ডমাষ্টার
হুমায়ূন আহমেদ।
এবং
তারই সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র
সিডিসি-কে।

‘বিজ্ঞান রূপকথার চেয়েও রহস্যময়।’
হুমায়ূন আহমেদ

চতুর্মাত্রিক জগৎ

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময় এই চারটি মাত্রা নিয়ে গঠিত জগৎকেই বলা হয় চতুর্মাত্রিক জগৎ। এই জগতের প্রাণীদের বলা হয় চতুর্মাত্রিক প্রাণী। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণই ত্রিমাত্রিক। ত্রিমাত্রিক প্রাণীরা যেমন চতুর্থ মাত্রা সময়ে পরিভ্রমণ করে চতুর্মাত্রিক প্রাণীরা ঠিক সেরূপ পঞ্চম মাত্রায় পরিভ্রমণ করে।

ঘরভর্তি ফিনাইলের কটু গন্ধ।

হাসপাতালের ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে পড়ে রয়েছে ফ্রিয়নের নিথর দেহ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে বেড়িয়ে এসেছে বিভিন্ন নল। শারীরিক যন্ত্রণা আগের মত নেই। আচ্ছা, সে কী মারা যাচ্ছে। না বোধ হয়, মারা গেলে ফিনাইলের কটু গন্ধ নাকে লাগত না। নিশ্চয়ই মারা যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের ইন্দ্রীয়গুলো নষ্ট হতে থাকে। তারচেয়ে বড়

কথা তার শ্রবণশক্তি চমৎকার কাজ করছে। কারণ, এক ধরনের চাপা শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আশেপাশের কোন যন্ত্র থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। ধীরে ধীরে চোখ দুটি খোলার চেষ্টা করে ফ্রিয়ন। হালকা নীল আলো ছড়িয়ে রয়েছে ঘরটাতে। শুরুতে কিছুটা ঝাঁপসা দেখা গেলেও সময়ের সাথে সাথে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ ঘরটির মাঝখানে একটি বেডে পরে রয়েছে তার দেহ। চমকে উঠে ফ্রিয়ন। সে নিজেকেই দেখছে। চোখ দুটি বন্ধ। একটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা দেহ। মাথার একপাশে বেডের সাথে লাগানো একটি মনিটর। শারীরিক অবস্থার নিখুত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রটা। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময় পর পর হৃদপিণ্ডের ওঠানামা সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ অজানা আশঙ্কা ভর করে ফ্রিয়নের মনে। এটা কীভাবে সম্ভব! মারা যায় নি। কিন্তু দেহ থেকে চেতনা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে! সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি সে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে থাকে। এমন সময় দরজা খুলে কেউ একজন প্রবেশ করল ঘরে। রোগা লম্বা একজন মানুষ। শরীরে এপ্রোণ জড়ানো। নিশ্চয়ই ডাক্তার হবে। ফ্রিয়ন চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে তাকে দেখতে থাকে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ লোকটি মাথা নিচু করে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে আছে। শিষ জাতীয় একধরনের শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। বারবার মনিটরটির দিকে তাকাচ্ছে আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। পুরোপুরি চোখ সরিয়েও নিতে পারছে না। হয়তো তার মনের ভেতর বড় রকমের দ্বিধার ভাব আছে যা সে কাটাতে পারছে না।

ফ্রিয়ন লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় এই প্রথম কথা বলার চেষ্টা করল, আপনি কি আমায় শুনতে পাচ্ছেন! এই যে, আপনাকে বলছি।

লোকটি কোন দিকে ফিরেও তাকাল না। বুঝাই যাচ্ছে সে ফ্রিয়নের কথা শুনতে পায়নি। অবশ্য শুনতে পাবার কথাও নয়। লোকটি কী যেন বিড়বিড় করতে করতে চিন্তিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একাকীত্ব ভর করল ফ্রিয়নের মনে। নিঃসঙ্গ মনে হলো খুব। নিজের নিস্তেজ দেহটা পরে আছে আইসিইউ'র বেডে। অথচ চেতনাটা আলাদা।

সম্পূর্ণ আলাদা। সময় বয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের দিকে তাকাল। ফ্রিয়ন। অদ্ভূত! সেখানে কোন ঘড়ি নেই। হয়তো কখনোই ছিল না। কিন্তু

স্পষ্ট মনে আছে ঘোরের মধ্যে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনতে শুনতেই জ্ঞান হারায় সে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি এসেছিল তার হাতে কী কোন ঘড়ি ছিল। সে যখন অজ্ঞান হয়ে পরে লোকটি কী তখন তার পাশেই ছিল। এমন হলে টিক টিক শব্দ মানুষটির হাতের ঘড়ি থেকেই এসেছে। এ ধরনের ঘড়িতো আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। বেশ কিছুদিন আগে নীরা একটি হাতঘড়ি তার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি। কিন্তু হারিয়ে যায় সেটা। আচ্ছা নীরা এখন কি করছে। নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও আছে। হয়তো তার কথা ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছে মেয়েটা। আহারে! নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ফ্রিয়নের। সবাইকে কী এক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেয়া হল। নীরা-কে দেখতে ইচ্ছা করছে খুব। কী শান্ত স্নিগ্ধ মুখ। মায়াকাড়া চোখ। কথায় কথায় অভিমান করবে আবার পরক্ষণেই ঠোট টিপে হাসবে। একদিন হঠাৎ ছুটে এসে বলল, আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মারা যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল এই মেয়ে সত্যি সত্যিই মারা যেতে চাচ্ছে। ঠিক তখনই সবাইকে অবাক করে শব্দ করে হাসলো। হাত রাখল ফ্রিয়নের হাতে। অদ্ভুত মেয়ে! নীরা যা করে তার সবকিছুই ভালো লাগে ফ্রিয়নের। এমন একটি মেয়ের ভালোবাসা পাওয়াতো ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যবান পুরুষ বলেই মনে হয় নিজেকে। এখন যদি সে মারা যায় যাবে। কিন্তু সেই সাথে নীরাকে সে হারিয়ে ফেলবে চিরদিনের জন্য। এই কথা ভেবেই দুঃখবোধ হচ্ছে ফ্রিয়নের। হয়তো আর কখনই পাশাপাশি বসে জোৎস্না দেখা হবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেউ জড়িয়ে ধরে বলবে না তোমাকে ভালোবাসি। ছোটবেলায় মা বলতেন কোন জিনিসের প্রতি খুব বেশি মায়া থাকতে নেই। যেই জিনিসের ওপর মায়া যত বেশি, সেই জিনিস হারিয়েও যায় ততো তাড়াতাড়ি। মা হয়তো বাবাকে খুব বেশি ভালোবেসেছিলেন। তাই হয়তো বাবা চলে গিয়েছিলেন ফেরার দেশে। সারা জীবন মাকে একা একা কাটাতে হয়েছে। কিন্তু না, ফ্রিয়ন মারা গেলে চলবে না। নীরার জন্য

হলেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবন থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়ার আছে তার। সময় বয়ে যেতে যাকে। একটা অদ্ভুত অবস্থায় আছে সে। অবচেতন নয়। তবে, দেহের সাথে কোন প্রকার সংযোগ নেই চেতনার।

হঠাৎ করেই ঝড়ের বেগে ঘরটিতে প্রবেশ করল সেই লোকটি। প্রায় সাথে সাথে নীরাকেও দেখা গেল পিছু পিছু। সবার দৃষ্টি মনিটরটির দিকে। সেখানে কিছু একটা ছিল। কারণ, এক ধরনের আতঙ্কের ছাপ পড়ল নীরার চোখে মুখে। লোকটি ফিরে তাকাল। হাত রাখলো নীরার কাঁধে। তার কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল হতাশা।

আমি দুঃখিত, নীরা। ফ্রিয়নকে হয়তো আর বাঁচানো সম্ভব নয়। সে কোমায় চলে গেছে। এ অবস্থা থেকে পেসেন্টের ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

নীরার কান্নাজড়িত কণ্ঠ শোনা গেল, কিছুই কি করার নেই! আমি ফ্রিয়নকে ছাড়া বাঁচবো না। সে এভাবে চলে যেতে পারে না। কিছু একটা করুন, ডাক্তার।

কিছুই করার নেই। এখন একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই পারে ফ্রিয়নকে ফিরিয়ে দিতে। আপনি প্রার্থনা করুন। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে সৃষ্টিকর্তা "চাইলে সবকিছুই সম্ভব।

বুঝাই যাচ্ছে ডাক্তারটি আস্তিক। সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরীক ক্ষমতার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। মাঝে মাঝে ভয়ংকর বিপদে প্রবল নাস্তিকেও দেখা যায় সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করতে। নীরা জানে না সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই। তবু সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, প্রার্থনা করবে ফ্রিয়নের জন্য। বিশ্বাস করতে শুরু করল তার ভালোবাসা তার কাছে ফিরে আসবেই। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নীরা। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল নিথর দেহটাকে।

এ সব কিছুই দেখছে ফ্রিয়ন। কিন্তু কিছু করতে পারছে না। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে, তোমাকে ভালোবাসি নীরা। তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। আমাকে ধরে রাখ। শক্ত করে ধরে রাখ।

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। ফ্রিয়নের চেতনা হারিয়ে যেতে থাকে অতল গহ্বরে। বুঝতে পারে এক অজানা গন্তব্যের পথে সে পা বারিয়েছে এইমাত্র। ফিনাইলের গন্ধটা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, ফিরে এসেছে টিক টিক শব্দটা। এভাবে চলল আরো কিছুক্ষণ। স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার চেনা-পরিচিত জগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সে। চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। এই অন্ধকারের সাথে তার কোন পরিচয় নেই। এক ভয়াবহ শূণ্যতা গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছু। চারপাশে শুধুই টিক টিক শব্দ। এভাবে কতক্ষণ চলল বলতে পারবে না ফ্রিয়ন। নীরার মায়াবী মুখটা মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তা আর মনে করতে পারছে না। সময় বয়ে যাচ্ছে। চারপাশের অন্ধকার তীব্র থেকে তীব্র হতে থাকে। এর নামই কী মৃত্যু! এই অন্ধকার গহ্বর-ই কী মানুষের শেষ আশ্রয়। না কি অন্যকিছু? এ জাতীয় চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। অবশিষ্ট চেতনাটুকুও নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তার আগেই কে যেন মিষ্টি করে বলল, আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরুন। এর মধ্যেই একটু ভালোবোধ করবেন।

ফ্রিয়ন চিৎকার করে বলতে চাইল কিছু একটা। কিন্তু যেখানে শরীর নেই, শুধু চেতনা কীভাবে কথা বলবে। প্রায় সাথে সাথেই আবার শোনা গেল কণ্ঠটা।

আপনি যা বলতে চান, সেটা চিন্তা করুন। তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো। এখানে শরীরের কোন প্রয়োজন নেই। আপনার নামটি মনে করার চেষ্টা করুন।

ফ্রিয়ন, আমি ফ্রিয়ন।

ফ্রিয়ন, আপনি এই মুহূর্তে আমাদের জগতে আছেন।

আপনাদের জগৎ?

হ্যাঁ, আমাদের জগৎ। প্রচণ্ড গতিতে ঘুর্ণায়মান একটি জগৎ। আপনারা একে বলেন চতুমাত্রিক জগৎ।

আমি এখন চতুর্মাত্রিক জগতে আছি! মানুষ মরে গেলে চতুর্মাত্রিক। জগতে চলে আসে?

না আপনি মারা যান নি। আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি।

আপনারা কারা?

আমরা চতুর্মাত্রিক প্রাণী।

আমার চারপাশ এতো অন্ধকার কেন? আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছিনা কেন? আপনারা কোথায়?

আমরা এখানে আছি। আপনি ত্রিমাত্রিক প্রাণী। আপনাদের ত্রিমাত্রিক জগতে সাদা আলোকে বিশ্লেষণ করলে যে স্পেকটার্ম পাওয়া যায়। তা সাতটি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মির সমষ্টি। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হয়। কোন নির্দিষ্ট বর্ণের বস্তুর উপরে যখন আলো পরে, বস্তুটি তখন ঐ নির্দিষ্ট বর্ণের রশ্মি ছাড়া বাকী রশ্মিগুলো। শোষণ করে নেয়। তখন ঐ নির্দিষ্ট বর্ণের রশ্মিটি চোখে এসে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আর এভাবেই কোন ত্রিমাত্রিক জিনিস আপনি দেখতে পান এবং অনুভব করতে পারেন। কিন্তু চর্তুমাত্রিক প্রাণীদের এ ধরনের কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। চতুর্মাত্রিক কোন কিছু আপনার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য হবে না।

আপনারা আমাকে এখানে কেন এনেছেন?

আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে আপনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য।

কারা নির্দেশ দিয়েছে?

পঞ্চম মাত্রিক জগৎ থেকে নির্দেশ এসেছে।

আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। পঞ্চম মাত্রিক জগৎ আবার কি?

এখন শান্ত হোন। ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবেন। আপনি এখন। প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান আছেন। যে গতি আলোর বেগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। কিছুক্ষণের মাঝেই অবচেতন হয়ে পরবেন। শীঘ্রই আবার কথা হবে। এই মুহূর্তের জন্য বিদায়।

কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ক্লান্তি নেমে আসে। ইন্দ্রীয় কেমন যেন ভোতা হয়ে আসতে থাকে। এসব কী হচ্ছে! ফ্রিয়ন কিছুই বুঝে উঠতে

পারে না। এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে অবচেতন হয়ে পড়ে। টিক টিক শব্দটা মিলিয়ে যেতে থাকে দূরে কোথাও।

কতক্ষণ অবচেতন ছিল ফ্রিয়ন, তা বোঝার কোন উপায় নেই। প্রবল তৃষ্ণা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখন চেষ্টা করলে এক সাগর পরিমান পানি খেয়ে ফেলা অসম্ভব কিছু না। তৃষ্ণার তীব্রতা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। এই মূহুর্তে আশেপাশের দৃশ্যপট পাল্টে যেতে শুরু করল। নিকষ কালো অন্ধকারের জায়গায় শুভ্র সাদা কুয়াশার মত কিছু তৈরি হচ্ছে। এভাবেই কেটে গেল কিছুক্ষণ। একটু দেরীতে হলেও একটা সুক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে পারল সে। শুভ্র সাদা কুয়াশাও কেটে যাচ্ছে। এই তো একটা নদী দেখা যাচ্ছে। নদীর টলমলে পানি দেখা যাচ্ছে। শান্ত, স্থির পানি। দু'পাশে ঘনজঙ্গল। সম্পূর্ণ পৃথিবীর দৃশ্য। একটা হরিণ শাবককে দেখা গেল মাথা নিচু করে পানি খাচ্ছে। মনে হয় চিত্রা হরিণ। একটু পর পর মাথা উঠিয়ে চোখ মিটমিট করে চাইছে। মায়াকাড়া টানাটানা চোখ। ঠিক পাশেই একটা ঝোপ নড়ে চড়ে উঠল। তারপর আবার সবকিছু শান্ত। শাবকটি নিশ্চিতে পানিতে চুমুক দিতে থাকে। সেই সময় প্রায় হঠাৎ করেই একটা বাঘ বেড়িয়ে আসে ঝোপটি থেকে। ভয়ংকর দর্শন বিশাল আকৃতির একটি প্রাণী। লক্ষ্যস্থীর করে ফেলেছে সে। হরিণ শাবকটাই তার শিকার। লম্বা ধারালো দাঁত নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল শিকারটির দিকে। একেবারে শেষ মুহুতে টের পেল শাবকটা। আর ঠিক তখনই বুঝতে পারে ফ্রিয়ন, এটা কোন বাস্তব দৃশ্য নয়। কারণ, সত্যিকার পৃথিবীতে নদীর পানি কখনো শান্ত, স্থীর হয় না। এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তার প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। সেই থেকেই হয়তো অবচেতন অবস্থায় একটা স্বপ্ন দেখছে মাত্র। যেখানে একটা হরিণ শাবক তৃষ্ণা মিটাতে পানির কাছে গিয়েছে। তবে, এই অবস্থায় কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব কিছুই ধরা যাচ্ছে না। তার এখন থাকার কথা হাসপাতালের একটি বেডে। অথচ সে চলে এসেছে চর্তুমাত্রিক জগতে। এটা কি খুব সম্ভব?

এই অসম্ভব ঘটনাটাই ঘটছে তার সাথে। চর্তুমাত্রিক প্রাণীদের খুব বুদ্ধিমান এবং উন্নত হবার কথা। তাদের তুলনায় মানুষের ক্ষমতা প্রায় নিম্নপর্যায়ের। এরা কি তাকে নিয়ে কোন পরীক্ষা করছে। মানুষ ল্যাবরেটরীতে নিম্ন শ্রেণির প্রাণীদের নিয়ে নানান পরীক্ষা করে। এখানেও কী সে রকমই কিছু হচ্ছে? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন জমতে থাকে। পানির তৃষ্ণাটাও এখন আর তেমন পীড়া দিচ্ছে না। ধীরে ধীরে তুষ্ণাটা কমতে শুরু করেছে। হঠাৎ করে চর্তুমাত্রিক প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল দ্বিতীয়বারের মতো।

আপনার কি তৃষ্ণা মিটেছে?

হ্যাঁ মিটেছে। কিন্তু আপনারা এতসব জানলেন কী করে? তৃষ্ণা বা কমলো কী করে?

আসলে আমরাই আপনার চেতনায় তৃষ্ণার অনুভূতি সৃষ্টি করেছি। আপনার চিন্তা চেতনার সাথে আমরা যুক্ত। আপনি এখন চর্তুমাত্রিক প্রাণীর মতোই আচরণ করছেন।

আমি এখন চতুমাত্রিক প্রাণীর মত আচরণ করছি?

হ্যাঁ। কারন, আপনি চেয়েছিলেন হরিণ শাবকটা যেন রক্ষা পায়। হিংস্র বাঘটার হাত থেকে। তাই কিন্তু ঘটেছে। বাঘটা শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। শান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

ফ্রিয়ন লক্ষ করল বাঘটা সত্যি সত্যিই ফিরে যাচ্ছে। কোন মতে বিস্ময় চেপে রাখার চেষ্টা করে বলল, এটা কোন বাস্তব দৃশ্য নয়। নদীর পানি কখনও শান্ত হয় না। এটা হতে পারে না। সবটাই আমার কল্পনা বা এই ঘটনাটাও আপনারা তৈরি করেছেন।

আর এটা আপনার কল্পনা নয়। আমরাও কোন কিছু তৈরি করিনি। আপনি যা দেখছেন, পুরোটাই বাস্তব। এটা ত্রিমাত্রিক জগতের একটি অজানা সময়ের দৃশ্য। ভালো করে চেয়ে দেখুন এটা কোন নদী নয়। তবে দেখতে কিছুটা নদীর মতই। আসলে, আয়তনে খুব বড় একটা দীঘি। একটু লম্বাটে।

তাই তো, আগে খেয়াল করিনি। কিন্তু আমি এই দৃশ্যটা কীভাবে দেখছি?

আগেই বলেছি আপনি এখন চতুমাত্রিক প্রাণীর মতো আচরণ করছেন। চর্তুমাত্রিক প্রাণীর কাছে সময় স্থীর। আর সময়ের প্রতি মূহুর্তেই তৈরি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। অর্থাৎ সময় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। জগগুলোর অবস্থান পাশাপাশি সমান্তরালে। অনেকটা খোলা বইয়ের মতই। যার প্রতিটি পৃষ্ঠা একেকটি জগৎ। যার শুরু শেষ যেকোনো সময়ের যেকোনো জগতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। চাইলে প্রবেশও করতে পারেন। আপনার গতি এখন আলোর গতির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। তাই আপনি এখন শক্তি। কোন বস্তু নন। সেই শক্তি আমাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ।

আমি এখন শক্তি! আমি আপনাদেরই অংশ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর আপনি মনের অজান্তেই এক অচেনা সময়ে উঁকি দিয়েছেন।

যদি তাই হয়। তবে, আমি স্পষ্ট দেখেছি যে বাঘটা তার শিকারকে নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। আমিও চাচ্ছিলাম সেরকমই হোক। হলোও তাই। আমি কী করে এটা করলাম?

হ্যাঁ, আপনি চেয়েছেন বলেই হয়েছে। আপনি এখন চতুমাত্রিক শক্তি। আপনার আচরণ চতুর্মাত্রিক প্রাণীদের মত। চতুর্মাত্রিক প্রাণী পারে ত্রিমাত্রিক কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করতে। ঠিক তেমনি ত্রিমাত্রিক প্রাণীও পারে দ্বিমাত্রিক কোন কিছুকে পরিবর্তন করতে।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

এ ধরুন আপনাকে একটা কাগজ দেয়া হল। কাগজটির উচ্চতা প্রায় শূণ্য। সুতরাং এর শুধু দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে। অর্থাৎ কাগজটি দ্বিমাত্রিক। এখন যদি কাগজটির মাঝখানে একটি বৃত্ত আঁকা থাকে এবং বৃত্তটির কেন্দ্রে একটি বিন্দু থাকে। তবে, কাগজটির ওপর থাকা দ্বিমাত্রিক কোন কিছুকে ঐ বিন্দুর কাছে পৌঁছাতে হলে বৃত্তটি ভেঙ্গে প্রবেশ করতে হবে। ঠিক তো?

হ্যাঁ, ঠিক।

কিন্তু দ্বিমাত্রিক কোন কিছুর পক্ষে বৃত্তটি ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এবার ধরুন আপনি ত্রিমাত্রিক প্রাণী, চাইলেন বিন্দুটি মুছে দিতে। আপনি তৃতীয় মাত্রা 'উচ্চতা' কে ব্যবহার করে একটি ইরেজার দিয়ে সহজেই বিন্দুটি মছে দিলেন। এতে করে আপনার বৃত্তভাঙ্গার প্রয়োজনই পরল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ত্রিমাত্রিক প্রাণী চাইলেই পারে দ্বিমাত্রিক কোন কিছুকে পরিবর্তন করতে। ঠিক তেমনি চতুর্মাত্রিক প্রাণী ত্রিমাত্রিক কিছুকে পরিবর্তন করতে পারে।

তার মানে যদি এমন হয় যে ত্রিমাত্রিক জগতে কোন মানুষের ব্রেইন টিউমার হয়েছে। আপনারা চাইলেই টিউমারটি অপসারণ করতে পারবেন এবং তা কোন অস্ত্রপাচার ছাড়াই!

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অনেকটা সে রকমই।

এমন কী হতে পারে পঞ্চমমাত্রিক কেউ আপনাদের নিয়ন্ত্রণ করছে?

হ্যাঁ, হতে পারে।

তাহলে কি ষষ্ঠ মাত্রা বলেও কিছু কি থাকতে পারে। যা নিয়ন্ত্রণ করছে পঞ্চম মাত্রাকে?

সে সম্ভাবনা তো আছে। তবে এ বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। তবে একমাত্র রুকাশই পারে এ বিষয়ে কিছু বলতে।

রুকাশ! তিনি কে?

ত্রিমাত্রিক জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হচ্ছে মানুষ। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটি হচ্ছে রুকাশ। অবস্থা করছেন আপনার সময় থেকে প্রায় এক হাজার বছর পরের পৃথিবীতে। কাজ করছেন চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ নিয়ে। তিনি আপনার অপেক্ষায় আছেন।

আমার অপেক্ষায়! আমি তো গণিত অথবা বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। তার সাথে আমার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে। আপনাকে পাঠানো হবে সেই সময়ে যে সময়ে রুকাশ অবস্থান করছে।

আমি এমনিতেই বিভ্রান্তিতে আছি। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

আপনি ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবেন।

আমাকে কখন পাঠানো হবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি একটি প্যারালাল সময়ের জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন।

তিনি কি আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন?

না। তিনি আপনার সম্পর্কে অবগত নন।

তবে?

আপনি দেখা করবেন রুকাশ এর সাথে।

তারপর?

তারপর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আমিতো এখন শক্তি। ঐখানে পৌঁছানোর পরও কি তাই থাকব?

না, ত্রিমাত্রিক জগতে প্রবেশ করতে হয় ত্রিমাত্রিক রূপেই।

তার মানে আমার দেহ থাকবে?

অবশ্যই থাকতে হবে।

ঐ জগত্তা কেমন হবে? পৃথিবী নিশ্চয়ই ততোদিনে অনেক এগিয়ে গেছে। আমি কি পারব খাপ খাইয়ে নিতে?

তা, ঠিক। ব্যাপারটা মোটেও সহজ হবে না। আপনাকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে, দু'জন মানুষ আপনাকে সাহায্য করবে। আপনিও তাদেরকে সাহায্য করবেন।

তারা কারা? খুব শীঘ্রই তাদের সাথে আপনার দেখা হবে।

ঐ জগতে প্রবেশের আগে আমি আমার স্ত্রী নীরার সাথে দেখা করতে চাই।

এখন আর তা সম্ভব নয়। আপনি ইতিমধ্যে ত্রিমাত্রিক জগতে প্রবেশের অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছেন। বিদায়। আপনার যাত্রা শুভ হোক।

ফ্রিয়ন প্রবেশ করে এক ভিন্ন সময়ের পৃথিবীতে। যেখানে অপেক্ষা করে আছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

ফ্রিয়ন তখনও জানে না এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাথে জড়িয়ে রয়েছে কল্পনাতীত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নিউরাল কম্পিউটার।

শক্তি বলয়

অনাকাঙ্খিত যেকোনো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের বিরুদ্ধে অতি ফলপ্রসু একটি উপায়ে। এতে তরিৎচৌম্বকীয় শক্তি ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনশীল প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে। তথ্য প্রবাহ একমুখি। অর্থাৎ কোন ধরনের সংকেত এই বলয়ের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। বিশেষ কোন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ জাতীয় শক্তি বলয় ব্যবহার করা হয়। মানব সম্প্রদায় আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতি।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

কোয়ার্টেজের কালো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিয়ানা। একটু পর পর চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে জানালার ওপাশের বর্ষনমুখর সকালটির দিকে। নিয়ানার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে। আজ একটা বিশেষ দিন শুধু এই কারনে নয়। আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগের এই দিনটাতে রিশানের

সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। সেই দিনও বৃষ্টি হচ্ছিল, আজও হচ্ছে।

রিশান সুদর্শন দায়িত্বশীল একজন মানুষ। তবে, নিয়ানার ব্যাপারে বরাবরই একটু উদাসীন। হয়তো প্রতিবছরের মত এবারও ভুলে গেছে আজকের দিনটির কথা। শুরুতে রিশানের এ ধরনের আচরনে কষ্ট পেলেও এখন দিব্যি মানিয়ে গেছে। রিশানকে প্রচণ্ড ভালোবাসে নিয়ানা। রিশান যখন তার কম্পিউটারের সামনে বসে ব্যস্ত সময় কাটায় নিয়ানা তখন নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসে। অপলকে তাকিয়ে থাকে প্রিয় মুখটার দিকে। আজ খুব ইচ্ছা করছে রিশানের হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে। তবে তা এখন সম্ভব নয়। এর জন্য আগে থেকে মুল কম্পিউটার সিডিসি-র অনুমতি নিতে হয়। নিরাপত্তা কেন্দ্র থেকে পাঠানো হয় বিশেষ ধরনের স্যুট। কারণ পৃথিবীর পরিবেশ এখন প্রায় বসবাসের অনুপযোগী। বৃষ্টির পানি বিষাক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভয়াবহ ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। এ সময় ঘর থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিলযোগ্য। তখন কোয়ারেন্টাইন স্যুট ব্যবহার করা হয়।

অনেককাল আগে মানুষরা বৃষ্টিতে ভিজতো। নিশ্চয়ই অনেক আনন্দের ছিল বিষয়টা। সেই সময়কার মানুষরা বৃষ্টি নিয়ে চমৎকার সব কথা লিখে গেছেন। তাদের আনন্দের কথা বর্ণনা করেছেন। এখন আর সেই সুযোগ নেই। কোয়ারেন্টাইন স্যুট পরে বৃষ্টিতে হয়তো বসে থাকা যায়। কিন্তু একফোটা পানিও শরীরে স্পর্শ পায় না। সাধারণত বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া এতো ঝামেলায় কেউ জড়াতে চায় না। তবুও কেন জানি আজ খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা হচ্ছে। পাশে থাকবে রিশান। ভাবতেই এতো আনন্দ হচ্ছে। এরকম আরো কিছু চিন্তা করতে করতে নিয়ানা তার ছোট্ট চতুষ্কোণ আকৃতির ঘরটি থেকে বসার ঘরে পা বাড়ালো।

একটু এগিয়ে যেতেই কার্বোডোর সাথে দেখা হয়ে গেল। তৃতীয় মাত্রার একটা রোবট কার্বোডো। বুদ্ধি নিম্ন পর্যায়ের। তবু সবসময়ই চেষ্টা